আলাউদ্দিনের বেহেশত বাস

আব্দুর রহমান আবিদ

এক।।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় আলাউদ্দিনের। বাথরুমে যাওয়া দরকার। কিন্তু অন্ধকারে দিকটা ঠিক ঠাওর করতে পারে না সে। দিনের বেলায়ই ভালমত সবকিছু দেখা যায় না এঘরে; আর এখনতো গভীর রাত। অন্ধকারে খানিকটা ভয় ভয় লাগে তার। দু'পাশে হাত বাড়িয়ে অন্যদের ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করে সে। আলাউদ্দিনের বয়স সাত। এ বয়সী বস্তির ছেলেদের ভয়-ডর বলে কিছু থাকে না। আজমত তার খালাতো ভাই। বয়সে তার চেয়ে বছর খানেকের ছোট। মল্লিকা হলের ন'টা-বারোটা শো'র দর্শকদের পকেট কাটে সে। রাত বারো, সাড়ে বারো তার কাছে কিছু না। কিন্তু আলাউদ্দিন আগাগোড়াই খুব ভীতু ধরনের। সন্ধ্যার পর একা একা কোথাও যেতে পারে না সে।

হাত বাড়িয়ে খোকন আর পিন্টু কে ছুঁয়ে দেখে আলাউদ্দিন। ঘুমোচ্ছে ওরা দু'জন। অন্ধকারটা একটু চোখ সওয়া হয়ে আসে এর মধ্যে। অন্যদেরকে এড়িয়ে পা টিপে টিপে বাথরুমের দিকে এগোয় সে। ফিরে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়ে আগের জায়গায়। দ্রুত চিন্তা করে আলাউদ্দিন। গত তিন দিন ধরে এই ঘরে ওদেরকে আটকে রেখেছে ফরিদা খালা। ফরিদা খালাকে তিন দিন আগেই প্রথম দেখে আলাউদ্দিন। পিন্টুর কেমন নাকি খালা হয় উনি। নীলক্ষেতের মোড়ে বিরানী খাওয়ানোর কথা বলে পিন্টু আর ওকে এখানে নিয়ে এসেছে খালা। তারপর থেকে ওদেরকে এ ঘরেই আটকে রেখেছে খালা। ইতিমধ্যে আরও চারজন যোগ হয়েছে ওদের সাথে। এদের সবার মধ্যে আলাউদ্দিনই সবচেয়ে বড়। সবচেয়ে ছোট টুটুল। বড় জোর সাড়ে চার হবে।

আরও ছোট থাকতে মার কাছে ছেলেধরার গল্প শুনেছে আলাউদ্দিন। ছেলেধরারা নাকি একবার ধরে নিয়ে গেলে হাত-পা বেঁধে কড়াই ভর্তি গরম তেলে ছেড়ে দেয়; তারপর মাছ ভাজির মত ভাজি করে খেয়ে ফেলে। আলাউদ্দিনের কখনও কখনও মনে হয়েছে ফরিদা খালা ছেলেধরা নয়তো! কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছে না সে। গত তিন দিনে ফরিদা খালা ছাড়াও মোটা মত আরও দু'জন লোক এসেছিল এই ঘরে। খানিকক্ষন থেকে কি সব কথাবার্তা বলে আবার বের হয়ে গেছে তারা। ওদেরকে ভাজি করে খেতে চাইলে এতদিনে নিশ্চয় তেল, কড়াই নিয়ে হাজির হতো তারা। 'মনে হয় না ফরিদা খালা ছেলেধরা' - মোটামুটি এরকম সিদ্ধান্তেই পৌঁছায় আলাউদ্দিন। কিন্তু তাহলে ফরিদা খালা ওদেরকে এখানে আটকেই বা রেখেছে কেন? কেন ওদেরকে যেতে দিচ্ছে না বাড়িতে? মা'র জন্যে মনটা খুব খারাপ লাগে আলাউদ্দিনের। তিন দিন ধরে মাকে দেখে না সে। সে অবশ্য অন্যদের মত কাঁদে না। তার বয়স তো সাত। ছোটদের সামনে কাঁদতে তার লজ্জা লজ্জা লাগে। সবচেয়ে বেশী কাঁদে রঞ্জু। প্রায় সারাদিন ধরেই 'মা'র কাছে যাবো', 'মা'র কাছে যাবো' বলে কাঁদতে থাকে সে। আলাউদ্দিনের ছোট একটা ভাই ছিল রঞ্জুর বয়েসী। জ্বরে মারা গেছে। রঞ্জুকে কাঁদতে দেখলে কেন জানি মরা সেই ভাইটার কথা মনে হয় তার। ভীষন মায়া লাগে রঞ্জুর জন্যে। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে রঞ্জুর কান্না থামাতে চেষ্টা করে সে। সব চেয়ে শক্ত হলো পল্টু। টুটুলের চেয়ে বয়সে একটু হয়ত বড় হবে ছেলেটা। গত তিন দিনে একবারও কাঁদেনি পল্টু। একবারও বলেনি 'মা'র কাছে যাবো'। পল্টু ওদের কারো সাথে কথাও বলে না। চুপচাপ বসে থাকে সারাদিন। কাছে গেলে খুব বিরক্ত হয়ে তাকায়। তারপরও কেন জানি পল্টুর জন্যেও খুব মায়া লাগে আলাউদ্দিনের।

ফরিদা খালা বলেছে আর দু'দিন পরেই বাসায় চলে যেতে দেবে ওদের সবাইকে। বাসায় ফিরে গিয়ে মা'কে প্রথমেই রঞ্জুর কথা বলবে আলাউদ্দিন। রঞ্জুরা থাকে মালিবাগ রেল বস্তিতে। মা'কে নিয়ে রঞ্জুদের বাসায় বেড়াতে যাবে সে। খোকনদের বাসায়ও বেড়াতে যাবে। খোকনও খুব ভাল বন্ধু হয়ে গেছে তার। খুব ভাল ঘুড়ি উড়াতে পারে আলাউদ্দিন। তার সাথে কাটাকাটি খেলায় সবসময় অন্যদের ঘুড়ি কাটা যায়। বাসায় ফিরে এদের সবাইকে ঘুড়ি কাটাকাটির টেক্‌নিক্‌টা শিখিয়ে দেবে সে। পল্টু মনে হয়না শিখতে চাইবে। সে তো কথাই বলে না তার সাথে। তারপরও চেষ্টা করবে সে পল্টুকে শেখাতে। শুয়ে শুয়ে ঘুড়ি কাটাকাটির বিশাল এক প্লান আটতে থাকে আলাউদ্দিন।

দুই।।

বেশ কিছুদিন হয় নতুন একটা জায়গায় এসেছে আলাউদ্দিনরা। হাওয়াই জাহাজে করে এসেছে। এটা যে বাংলাদেশ না, সেটা অন্তত বুঝতে পারে আলাউদ্দিন। এখানে আসার পর খোকন, পল্টু আর রঞ্জু আলাদা হয়ে গেছে ওদের কাছ থেকে। একদল নতুন ছেলের সাথে থাকতে দেয়া হয়েছে ওদেরকে। এদের প্রায় সবাই-ই বয়সে তার চেয়ে ছোট। বিশাল হলরুমের মত একটা ঘরে থাকে ওরা। খাওয়া দাওয়ার খুব আরাম এখানে। বাথরুমগুলো কি সুন্দর! ঝক ঝক করে সবসময়। ঘরটাও বেশ ঠান্ডা। সবসময় কেমন যেন শীত শীত ভাব। খাওয়া দাওয়া আর গরমের খুব কষ্ট হয়েছে ফরিদা খালার সেই ঘরে। এ জায়গাটা তার তুলনায় বেহেশত। আচ্ছা, এটা বেহেশত নাতো? খানিকটা সন্দেহ হয় আলাউদ্দিনের। বস্তির টিনের ঘরে যে হুজুর নামাজ পড়াতো, তাকে দেখিয়ে মা প্রায়ই বলতো ওরকম হতে পারলে সেও নাকি বেহেশতে যাবে হুজুরের মত। মা বলতো সব হুজুররাই নাকি বেহেশতে যাবে। অদ্ভুত নাকি সেই বেহেশত। সেখানে গরম লাগে না; মশা কামড়ায় না; ভাল ভাল সব খাবার খাওয়া যায়; আরও কত কি! যারা ওদেরকে সকাল-বিকাল খাবার দিতে আসে, তারা দেখতেও তো সেই হুজুরের মতই। হুজুরের মতই লম্বা জামা পরে, মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। কথাও বলে অন্য ভাষায়; বাংলা বলে না। কিন্তু বেহেশতের সাথে সবটা আবার মেলেও না মা'র বর্ননা মত। বড় বড় ফুলের বাগানে নাকি ইচ্ছে মত ঘুরে বেড়ানো যাবে বেহেশতে। ইচ্ছে করলে আলাউদ্দিন নাকি ঘুড়ি কাটাকাটিও খেলতে পারবে সেখানে। কিন্তু সেই যে এই ঘরের মধ্যে এনে ওদেরকে ঢুকিয়েছে এরা, তারপর একদিনের জন্যেও আর বাইরে যেতে দেয়নি। কাজেই আলাউদ্দিন ঠিক বুঝতে পারে না এটা কি বেহেশত নাকি বেহেশত না।

সকালে ঘুম ভেঙে হুজুরের মত চেহারার একদল লোককে তাদের ঘরে দেখতে পেল আলাউদ্দিন। দেখলো ঘরের আরেক পাশের বড় দরজাটা আজ খোলা। সেখানে বিশাল একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। আলাউদ্দিন বুঝলো ট্রাকে করে তাদের কে কোথাও নিয়ে যাবে এরা। আলাউদ্দিনকে যখন বিশাল একটা উটের পিঠে চড়ানো হলো, তখনও ভয় পায়নি সে। আশ-পাশে তাকিয়ে দেখলো সবাইকেই উটের পিঠে চড়ানো হচ্ছে। মজাই লাগলো তার। কত ভাল এরা! ভাল ভাল খাওয়াচ্ছে। ভাল জায়গায় থাকতে দিচ্ছে। এখন আবার উটের পিঠে চড়িয়ে বেড়াতেও নিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ভয় সে তখনই পেল যখন দেখলো তাকে উটের পিঠে বেঁধে ফেলা হচ্ছে। যে লোকটা তাকে বাঁধলো, ভয়ঙ্কর তার চেহারা। লোকটা মোটা একটা রশি দিয়ে উটের পিঠে তাকে এত টাইট্ করে বাঁধলো যে, আলাউদ্দিনের মনে হলো রশিটা তার গা কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো সে।

গুলির শব্দে চমকে উঠলো আলাউদ্দিন। আর সাথে সাথেই হ্যাঁচকা টান পড়লো তার শরীরে। তারপর মনে হলো বাতাসে যেন দুলছে সে। দেখলো চারিদিকে ধূলোর পাহাড়। মনে হলো কে যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ধূলোর পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। তাকে পিঠে নিয়ে উটটা যে পাগলের মত ছুটছে - এটা বুঝতে খানিকটা সময় লাগলো তার। যখন বুঝলো, তখন পৃথিবীর সমস্ত ভয় পেয়ে বসলো তাকে। মনে হলো সমস্ত খাবার যেন পেট থেকে তার গলায় উঠে আসছে। ভয়ে মা'কে ডাকতে চাইলো সে। কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুলো না তার। ঢোক গিলতে গিয়ে বুঝলো, ঠিকমত নিশ্বাস নিতে পারছে না সে। তার উটের পাশাপাশি ছুটছে অনেকগুলো উট। প্রতিটার পিঠেই কেউ না কেউ বাঁধা। মা'র সাথে বুড়িগঙ্গায় একবার নৌকা বাইচ্ দেখতে গিয়েছিল আলাউদ্দিন। ঝড়ের বেগে পাশাপাশি ছুটছে রং বেরং এর সব নৌকা - অসাধারন সেই দৃশ্য। আলাউদ্দিনের মনে হলো এটা বোধহয় সেরকমই কিছু হবে; হয়ত 'উট বাইচ্'। কিন্তু নৌকা বাইচে বড় বড় সব লোককে নৌকা চালাতে দেখেছে আলাউদ্দিন; উট বাইচে তার মত শিশুরা কেন? হঠাৎই গতি বাড়লো তার উটের। মনে হলো উট বাইচে সবাইকে যেন হারাতে চায় সে। একে একে সবাইকে পিছু ফেলে ছুটে চললো তার উট। সবচেয়ে সামনের ধূসর রং এর উটটাকে পিছু ফেলার সময় পল্টুকে চিনতে পারলো আলাউদ্দিন। ক্যামন যেন কাত হয়ে বসে রয়েছে পল্টু উটটার পিঠে। পলকহীন চোখে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে পল্টু। কিন্তু সে চোখে আজ বিরক্তি নেই। রয়েছে একরাশ ভয়। মৃত্যু কাকে বলে, মানুষ কিভাবে মরে - সে সব ঠিক জানেনা আলাউদ্দিন। কিন্তু পল্টুকে দেখে কেন জানি সে বুঝতে পারলো - পল্টু ভয়ে মরে গেছে। পল্টুকে দেখতে অবিকল তার মৃত ছোট ভায়ের মত লাগছে। তার ইচ্ছে হলো হাত বাড়িয়ে পল্টুকে ছুঁয়ে দেয়। দেখলো হাতটা বাড়াতেও পারছে সে। শরীরে রশির বাঁধনটাকেও হালকা মনে হলো। পরক্ষনেই বুঝলো রশি ছিঁড়ে উটের পিঠ থেকে আসলে পড়ে যাচ্ছে সে। মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলো উটের কুঁজ আঁকড়ে ধরার। একসময় ছিটকে পড়লো আলাউদ্দিন উটের পিঠ থেকে। পৃথিবীটা কেঁপে উঠলো তার চোখের সামনে। মনে হলো পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন ক্রমশঃ নিভে আসছে। সেই নিভে আসা আলোর মাঝে আলাউদ্দিন দেখলো, পল্টুকে পিঠে নিয়ে তার দিকেই ছুটে আসছে ধূসর রং এর সেই উটটা - ছুটে আসছে সোজা তার দিকে।।

শেষ কথা।।

মধ্যপ্রাচ্যের দু'একটা দেশে নিয়ম করে প্রতিবছর উট রেস্ হয়। এসব রেসে উটের জকি হিসেবে ব্যবহার করা হয় ছোট ছোট শিশুদেরকে, যাদের বেশীর ভাগই আমাদের উপমহাদেশ থেকে পাচার হয়ে আসা। উট রেসে শিশুদের ব্যবহারের এই অমানবিক ঘটনা যুগ যুগ ধরে ঘটে আসছে মধ্যপ্রাচ্যে। বিশ্বব্যাপী প্রতিটা বিবেকবান মানুষের উচিত এর প্রতিবাদ করা। আসুন আমরা সবাই মিলে এর প্রতিবাদ করি।।

আব্দুর রহমান আবিদ, আমেরিকা থেকে
Email: abid921@yahoo.com